সেলিম রেজা নিউটন

ধর্ষণ বলপ্রয়োগ বলাৎকার



Fernando Botero. Abu Gharib

১.১ গণধর্ষণের গণতন্ত্র

সত্যিকারের ধর্ষণ এক ঘটনা, আর তার মিডিয়া-কাভারেজ এবং এ সম্পর্কিত লেখালিখি, গবেষণা, আলাপ-আলোচনা ও কথাবার্তা আলাদা ঘটনা। নয়াদিল্লীর সড়কে চলমান বাসের মধ্যে কয়েকজন মাতাল পুরুষ কর্তৃক দলবদ্ধভাবে একজন নারীকে ধর্ষণ করে বাস থেকে ফেলে দিয়ে হত্যা করার ঘটনাটিকে আমাদের ‘গণতান্ত্রিক’ মিডিয়া দিব্যি ‘গণধর্ষণ’ কথাটা দিয়ে চালাচ্ছে। ‘গণধর্ষণ’ কথাটা মোটেও গণতান্ত্রিক নয়। ‘গ্যাং রেপ’ এবং ‘গণধর্ষণ’ কথা দুটির

মধ্যে পার্থক্য আকাশপাতাল। নিওলিবারাল বাণিজ্যপুঁজির বৈশ্বিক প্রভুদের তরফে তাঁদের স্থানীয় প্রতিনিধি হিসেবে 'প্রথম আলো' নামের যে কর্পোরেট-বিজ্ঞাপনপত্রটি বাংলাদেশকে পথ দেখানোর ও পরিচালনা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে বলে মনে হয়, তারা পর্যন্ত 'গণধর্ষণ' অব্যাহত রেখেছে। প্রথম আলো তাই বলে কোনো অগণতান্ত্রিক কাজ করছে তা নয়। বিদ্যমান মিডিয়া-গণতন্ত্রে প্রথম আলো সংখ্যালঘু নয়, সংখ্যাগুরুরই দলে। মিডিয়ায় ধর্ষণ প্রসঙ্গে কথা বলার সময় ধর্ষিতা নারীকে যেভাবে 'ভিক্টিম' হিসেবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে তা-ও খেয়াল করার মতো। এই আখ্যা ঘোষণা করে: পুরুষ হলো শিকারী, নারী তার শিকার। যেন ধর্ষণ একটি প্রত্যাশিত ঘটনা।

১.২ প্রলোভন: বিদ্যমান গণতন্ত্রের পলিটিক্যাল ইকনোমি

আজকের সারা দুনিয়ায় প্রলোভন বৈধ ব্যাপার। মৌলিকভাবে দরকারি ব্যাপার। প্রলোভন ছাড়া বিজ্ঞাপন অচল। বিজ্ঞাপন ছাড়া পণ্য অচল।[১] পণ্য ছাড়া নিত্যনতুন বাজারি উৎপাদন অচল। প্রবৃদ্ধি ধপাস। এই হলো নয়া উদারনীতিবাদী আর্থরাজনৈতিক ব্যবস্থা। এই হলো বিদ্যমান গণতন্ত্রের পলিটিক্যাল ইকনোমি। টিভিতে পত্রিকায় সিনেমায় নাটকে বিজ্ঞাপনে গল্পে সাহিত্যে প্রবন্ধে এবং গবেষণায় 'প্রলোভন' আজকে প্রধানতম থিম সং। মান্না দে'র সেই গানের কথা কে না জানে: 'ও কেন এত সুন্দরী হলো, অমনি করে ফিরে তাকালো, দেখে তো আমি মুগ্ধ হবই, আমি তো মানুষ'। মনুষ্যত্বের মাপকাঠি হলো: সে স্ট্যান্ডার্ড-সৌন্দর্যের প্রলোভন বোঝে কিনা। এমনই এই লোভের অর্থনীতি যে বন্ধুত্বেও প্রলোভন থাকে। ধর্ষণেও

---

[১] কেন বিজ্ঞাপন ছাড়া পণ্য-বিপণন অচল, এমনকি খোদ পুঁজিবাদী অর্থনীতি অচল, সে বিষয়ক আলোচনার জন্য দেখা যেতে পারে বিনয় ঘোষ, ১৯৯১-এর অন্তর্ভুক্ত 'বিজ্ঞাপন ও মন' নামের দুর্দান্ত, ধ্রুপদী প্রবন্ধটি।

প্রলোভন থাকে। অন্য সব প্রলোভনকে বহাল রেখে ধর্ষণের প্রলোভন উচ্ছেদ করা কি সম্ভব? যদি সম্ভব হয়ও, খোদ প্রলোভন নামক জিনিসটা কিন্তু থেকেই যায়। প্রলোভন থাকলে তার নানারকম রোগলক্ষণের অভিপ্রকাশও ঘটে। এই যদি হয় খোদ সমাজ-বন্দোবস্ত তাহলে থানা পুলিশ-আদালত-কারাগার, এমনকি ফাঁসি, দিয়েও শান্তি পাব না আমরা।

১.৩ ধর্ষণ – আইনের শাসনের বিজ্ঞাপন

বলপ্রয়োগ আজকের দুনিয়ায় সবচাইতে বৈধ কাজ। ডারউইনের ‘সারভাইভাল ফর দ্য ফিটেস্ট’ এর নাম দিয়ে, মার্কসের শ্রেণীবিদ্বেষের নাম দিয়ে, মর্গানের বর্বরতার নাম দিয়ে বৈধ করা হয়েছে জোর যার মুল্লুক তার নীতি। ‘মাইট ইজ রাইট’ আজ গ্রাহ্য প্রবাদবাক্য। ‘মাইরের উপ্রে ওষুধ নাই’ তত্ত্ব হাজির কার্টুন পত্রিকার মলাটে। মা-বাবার তরফে বাচ্চাকে মারা, শিক্ষকের দিক থেকে শিক্ষার্থীদেরকে মারা, গৃহস্তের পক্ষ থেকে চোর পিটানো, জনতার উৎসাহে গণপিটুনি, স্বামীজীর স্বহস্তে বউকে পিটানো, পুলিশের লাঠি দিয়ে প্রাক্তন মন্ত্রীকে পিটানো— এগুলো মামুলি ঘটনা মাত্র।

এই সমাজে সহিংসতা বৈধ। বলপ্রয়োগই রাষ্ট্রের অস্তিত্বের যুক্তি। পরিবার থেকে প্রশাসন পর্যন্ত যাবতীয় প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি বলপ্রয়োগ। বলপ্রয়োগ ও প্রতিশোধগ্রহণ খোদ আইন-আদালত-বিচারব্যবস্থার সর্বসম্মত ভিত্তি। ‘আইনের শাসন’ বলে যে জিনিসটা চালু আছে তা আসলে মহাভারত-কথিত আদিতম শাস্ত্র ‘দণ্ড-নীতি’। দণ্ড ধারণাটিই পুরুষতান্ত্রিক। পুরুষের বিশেষ দণ্ড, বংশদণ্ড, লৌহদণ্ড ইত্যাদি। কারাগারে, রিম্যাণ্ডে, আটকাবস্থায় পুরুষের গুহ্যদ্বারে দণ্ডপ্রয়োগের ঘটনা এই এক-এগারোর শাসনামলেও ঘটেছে। আর রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারের খাপরা ওয়ার্ডে ইলা মিত্রের যোনীতে গরম ডিম ঢুকানোর ঘটনা তো সেদিনকার ঘটনা

মাত্র। ধর্ষণ জিনিসটা তাই আইনের শাসনের নিছক একটি বিজ্ঞাপন বা প্রকাশ। আইনের শাসনের মূলনীতি বলপ্রয়োগ; আর ধর্ষণের মূলনীতি বলাৎকার। এইটুকুই যা পার্থক্য। আসলে ঐটুকুই তো মিল। অভিধান ও অর্থতত্ত্ব বলছে, বলপ্রয়োগ আর বলাৎকার আদতে একই বস্তু।

১.৪ বলাৎকারের শব্দার্থতত্ত্ব

এ সমাজ আসলে বলপ্রয়োগের, বলাৎকারের। সহিংসতা মাত্রেই বলাৎকার। বলাৎকার কথাটার একটি অর্থ যেমন 'ধর্ষণ', তেমনই বলাৎকার কথাটার অপর অর্থ বলপ্রয়োগ, তথা 'শক্তিপ্রয়োগ', 'অত্যাচার', 'জুলুম', 'জবরদস্তিমূলক আচরণ' (বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান)। 'বলাৎকার' হচ্ছে এক দিকে 'বল দ্বারা করণ, বলপ্রয়োগ', 'অন্যায়', 'অত্যাচার'; এবং অন্য দিকে 'বলপূর্ব্বক সতীত্বনাশ (রেপ)'; শুধু তাই নয়, 'ঋণীকে স্বগৃহে আনিয়া তাড়নাদি দ্বারা ঋণ দেওয়ানো'ও 'বলাৎকার' বটে (হরিচরণ বন্দোপাধ্যায়, ১৯৯৬-ক; ১৯৯৬-খ)। সুতরাং বলাৎকার স্রেফ নারীর ওপরই ঘটে না, পুরুষের ওপরও ঘটে। অভিধান অনুসারে, 'বলাৎকৃতা' যেমন হয়, তেমনই 'বলাৎকৃত' বা 'পরবশীভূত'ও (হরিচরণের বঙ্গীয় শব্দকোষ) হয়। মোদ্দা কথায় এ হচ্ছে, পরের আকাঙ্ক্ষা দ্বারা আক্রান্ত হওয়া।

যেহেতু ঘটনাটা বলপ্রয়োগের, আধিপত্যের– টার্গেট সবসময়ই তাই দুর্বল সত্তা। টার্গেট তাই নারী, বৃদ্ধ, বালক, শিশু, গরিব, প্রান্তিক জনজাতি ইত্যাদি। পুরুষ-শিশুও ধর্ষণ এবং সহিংস যৌন নিপীড়ন থেকে রেহাই পায় না। বাসায় না, স্কুলে না, স্কাউট ক্যাম্পে না, ছাত্রাবাসে না, মক্তবে না, মাদ্রাসায় না, এমনকি মসজিদেও না। পুরুষ-বাচ্চার বলাৎকার অবশ্য আমাদের সমাজে অনালোচ্য। স্ট্যান্ডার্ড পুরুষতান্ত্রিক কোড মোতাবেক পুরুষ ধর্ষণযোগ্য নয়।

ধর্ষিত পুরুষ আরেকটা ‘মাগি’ মাত্র, ‘মরদ’ নয়।

১.৫ আত্মমর্যাদার বিকার, সম্পর্কের বিকার

সমাজে আত্মমর্যাদাবোধ, স্বাতন্ত্র্যবোধ, স্বাধীনতা ও আত্মকর্তৃত্বের বোধ যে পরিমাণে বিকারগ্রস্ত হচ্ছে, সম্ভবত সেই পরিমাণে বাড়ছে ধর্ষণ। যার আত্মমর্যাদাবোধ নাই সে-ই অন্যের আত্মমর্যাদার মূল্য বোঝে না, তাকে ভূলুণ্ঠিত করতে পারে। যার নিজেরই স্ব-অধীনতার বোধ নাই, দাসত্বের অপমানবোধ নাই, সে অন্যের স্বাধীনতার মূল্য বোঝে না। অন্যের উপর বলপ্রয়োগের মূঢ়তায় সে আনন্দ অনুভব করে। আত্মমর্যাদার বোধ ও স্বাধীনতার বোধের অভাব পূরণ হয় অপরের উপর কর্তৃত্ব ফলানোর বোধ দিয়ে। এই কর্তৃত্বনীতিতেই সমাজ চলে।

ধর্ষণ হলো সম্পর্কের বিকার। ধর্ষণের দ্বারা সাধিত কৌমার্যের ক্ষতি বা শরীরের ড্যামেজ আসল ব্যাপার না। ‘কৌমার্যের ক্ষতি’ বানানো একটা পুরুষতান্ত্রিক ধারণা মাত্র। যৌন অর্থে বলাৎকারই শুধু নয়, শরীরের ওপর যেকোনো প্রকার বলপ্রয়োগ বা সহিংসতাই শরীরের ক্ষতি করতে পারে। ধর্ষণে সবচেয়ে বেশি বিনষ্ট হয় আসলে আত্মমর্যাদা। আত্মমর্যাদার যেকোনো বিনাশই ধর্ষণ। এ হলো আত্মার ক্ষতি। যেকোনো প্রত্যক্ষ বলপ্রয়োগেই এটা ঘটে। চূড়ান্ততম মাত্রায় ঘটে ধর্ষণে। আত্মমর্যাদা কীভাবে সংজ্ঞায়িত হচ্ছে তার ওপর তাই নির্ভর করে ধর্ষণের সংজ্ঞা।

১.৬ বিবাহ, ব্যক্তিগত মালিকানা, ধর্ষণ

ব্যক্তিগত মালিকানার উত্তরাধিকার-প্রথাকে নিশ্চয়তার সাথে টিকিয়ে রাখার জন্য দরকার নারীর ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। এই নিয়ন্ত্রণ ভেঙে পড়লে, কে কোন পুরুষের সন্তান তা নিশ্চিত হওয়া না গেলে, পৃথিবীতে সাদা-কালো ধনী-দরিদ্র দাস-মালিক কর্তা-গোলাম

ব্রাহ্মণ-শূদ্র বাঙালি-পাহাড়ি কোনো প্রকারের বৈষম্য টিকিয়ে রাখা যায় না। বৈষম্য না টিকলে কর্তৃত্বতন্ত্রও টেকে না। সব কিছু ভেঙে পড়ে। তাই মালিকের সন্তান যে মালিকেরই, প্রমাণ সহকারে তা চিনতে পারার জন্য বিবাহ বা 'বিশেষভাবে বহনীয়' চুক্তির মাধ্যমে নারীকে বন্দি বা নজরবন্দি করে রাখতে হয়। এ ছাড়া উত্তরাধিকারের উপায় নেই। এ ছাড়া বিবাহেরও অর্থ নেই। বিবাহ আসলে একটি রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক ও আইনগত সম্পর্কচুক্তি যা দিয়ে সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা, যাবতীয় বৈষম্য এবং কর্তৃত্বতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখা যায়।

এরই জন্য পাঁচ হাজার বছরের কর্তৃত্বপরায়ণ অসভ্যতা নারী-পুরুষকে পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। পরস্পরকে বানিয়ে রেখেছে পরস্পরের অচেনা। এ হচ্ছে 'ভাগ করো এবং শাসন করো'র বিশ্বজনীন-সর্বজনীন ধ্রুপদী দৃষ্টান্ত। নারী-পুরুষের এই বিভাজন বহুবিধ রূপ ধারণ করে বিরাজ করছে আজকের পৃথিবীতে। নারীপুরুষের প্রাতিষ্ঠানিক, আইনী, শাস্ত্রীয় ও রাষ্ট্রীয় এই বিভাজনের একেবারে কেন্দ্রে আছে বিবাহের ধারণা। বঙ্গভারতীয় পুরাণের নবতর পাঠের মাধ্যমে কলিম খান দেখিয়েছেন, বিবাহ মানে বিশেষভাবে বহনযোগ্য চুক্তি। বিবাহ মানেই বন্ধন। বিবাহবন্ধন।

বিবাহ-বিভাজন আছে বলেই ধর্ষণ এবং দাম্পত্য-সহিংসতা আদৌ সম্ভব হয়ে ওঠে। নারীকে বন্দি বা নজরবন্দি রাখার একটি উপায় যদি হয় বিবাহ, তো অপর উপায়টি হচ্ছে ধর্ষণ। ধর্ষণ বিবাহেও সিদ্ধ, বিয়ের বাইরেও সিদ্ধ। একে অন্যের পরিপূরক মাত্র। বিবাহ হচ্ছে ঐতিহাসিকভাবে সৃষ্ট দুই প্রতিপক্ষকে শাস্ত্র ও যৌনতার আঠা দিয়ে পরস্পরের সাথে সেঁটে রাখা। এ থেকে যা উৎপন্ন হয় তা ভালোবাসা নয় – হিংসা ও ঘৃণা। পিতা কর্তৃক কন্যা ধর্ষণ, কন্যাসম মেয়েদের ধর্ষণ বা নিপীড়ন অপ্রচলিত কিছু নয়। (উল্লেখযোগ্য মাত্রায় নানা অর্থে ব্যতিক্রম যে আছে সে কথা সকলেই জানা।) তাই

ধর্ষণের বিরুদ্ধে বলা অথচ বিদ্যমান বিবাহের বিরুদ্ধে না বলা রীতিমতো আত্মঘাতী আস্ফালন মাত্র।

১.৭ কাম প্রেম ধর্ষণ

নারী এবং পুরুষের মাঝখানে উপস্থিত যৌন ক্ষুধা এবং যৌন অবদমন। দু-জনের বেলায় এর প্রকাশ দু-রকম। পুরুষের বেলায় আগ্রাসন-আক্রমণ, অর্থাৎ নারীধর্ষণ। নারীর বেলায় যৌনসত্তার 'সেক্সি' বিনির্মাণ ও বিনিময় দিয়ে পুরুষকে ম্যানিপুলেট করা, করায়ত্ত করা। নির্দিষ্ট মাপমতো যৌনতা এখন ক্ষমতা বৈকি। এ দিয়ে পুরুষকে কব্জা করা যায়। দুটোই পুরুষতান্ত্রিক। দুটোই প্রেমহীন। কামপরায়ণ। প্রেম মানে সঙ্গীকে পরিতৃপ্ত করে নিজে সুখী হওয়া। কাম মানে সঙ্গীকে ব্যবহার করে আত্মরতি চরিতার্থ করা। এ আসলে কর্তৃত্বপরায়ণ বাসনা। অথরিটারিয়ান ডিজায়ার অফ ডমিনেশন। এই সুখ আধিপত্যের বিকৃত সুখ – এমনকি খুনের ক্ষেত্রেও, এমনকি ধর্ষণের ক্ষেত্রেও। দুটোই যুগের অসুখ। দুটোই নিওলিবারাল কালপর্বের রোগলক্ষণ। এই রোগ রাজনৈতিক, মানে ক্ষমতাকেন্দ্রিক– সামাজিক নয়। তাই বলে কোনোটাই অপরটার কারণ নয়। একটা আরেকটার ফলাফলও নয়। উভয়েরই কারণ কর্তৃত্বতন্ত্র। উভয়েরই ফলাফল কর্তৃত্বতন্ত্র। এ দুটোর একটা দিয়ে আরেকটাকে জায়েজ করা যায় না কিছুতেই। দুটোই অগ্রহণযোগ্য। দুটোই বাজারের বিকার। বাজারের যুগে মনুষ্যত্বের বিকার। সমাজের সর্বত্র এই বিকার দৃশ্যমান। শিক্ষার্থী-শিক্ষক অফিসার-কর্মচারী বিক্রেতা-খরিদ্দার উকিল-মক্কেল বিচারক-অপরাধী ডাক্তার-রুগি নারী-পুরুষ চোর-পুলিশ ইত্যাদি সম্পর্ক সমুচয়ে এই বিকারের আছর পড়েছে।

ধর্ষণে যৌনসুখ নাই। এটুকু বোঝার মতো সাবালক হতে যে আত্মঅনুসন্ধান ও নিবিষ্টতা লাগে তা এই বাজারের যুগে নাই। দম

ফেলার সময় নাই কারো। আমি কে? আমি কী ভাবে (যৌনকর্মের পরিণামে) এখানে এলাম? এই কর্মের সারসত্য কী? এর সারসত্তাই বা কী? সুখ কী বস্তু? কাম আর প্রেমের পার্থক্য কী? প্রেম আর যৌন আনন্দের মধ্যে সম্পর্ক কী? এ সব নিয়ে নিবিষ্ট আত্মঅনুসন্ধানে নিরত থেকে যৌনতা, লিঙ্গসত্তা এবং প্রেম বা আনন্দের স্বরূপ উপলব্ধি করার সময় পুরুষ-সমাজের নাই। নারীকূলেরও নাই। এর জন্য দায়ী অবশ্য নারী-পুরুষ নয়। দায়ী আর্থরাজনৈতিক ব্যবস্থা। রাজনীতি মানেই চিন্তা না করা। রাজনীতি মানে অনুগত থাকা। আনুগত্য মানেই আনুগত্যের প্রতিযোগিতা। সর্বগ্রাসী প্রতিযোগিতা মানেই গণ্ডগোলের আশঙ্কা এবং আশঙ্কার কিছু না কিছু বাস্তবায়ন।

১.৮ ধর্ষণ কোনো ফৌজদারি মামলা নয়

ধর্ষণ তাই ব্যক্তিগত মামলা নয়। ধর্ষণ কোনো ফৌজদারি মামলাও নয়। কোনো ক্রাইমই আসলে ক্রিমিনাল কেস নয়, পলিটিক্যাল কেস। ধর্ষক হয়ে ওঠার আগেই সম্ভাব্য ধর্ষকের সামনে সদাহাজির থাকে খোদ 'ধর্ষণ' এর ধারণা। ধর্ষক, খুনী, চোর, রাজনীতিবিদ বা মুনাফাখোর কেউই 'বিশেষ' কোনো পৃথক এক প্রকার জীব নয়। এরা কারো স্বামী, কারো স্ত্রী, কারো সন্তান, কারো সাথী। সবাই বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার শিকার। প্রত্যেকটা ধর্ষণই তাই রাজনৈতিক ধর্ষণ, রাষ্ট্রীয় ধর্ষণ; প্রত্যেকটা অপরাধই যেমন রাজনৈতিক অপরাধ এবং প্রত্যেক বন্দিই যেমন একেক জন রাজবন্দি। এগুলো রাষ্ট্রপ্রণালীর অন্তর্গত উপাদান মাত্র। প্রশ্নটা পুরো সমাজের সংবেদনশীলতা এবং দায়দায়িত্বের। প্রশ্নটা যুগের চলন পাল্টে দেবার।

কে ধর্ষণ করল, কাকে ধর্ষণ করল – তার চেয়ে বড় কথা হলো ধর্ষণ ঘটনাটা সমাজে যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ কেউ নিরাপদ না। যেকেউ যখন-তখন ধর্ষিত হবে। ধর্ষণের বিশেষ একটি ঘটনার চেয়ে

খোদ ধর্ষণের ধারণা বেশি মারাত্মক। খোদ জেলখানার চেয়ে জেলখানার ধারণা যেমন বেশি বিপজ্জনক। পাথরের কারাগারের চেয়ে কাগজের কারাগার, ভাবনার কারাগার, ধারণার কারাগার অধিক ভয়ংকর। দিল্লীর চলন্ত বাসের ধর্ষণের চেয়ে বোম্বের ডিজিটাল ধর্ষকাম ঢের বেশি আত্মঘাতী। চোখে চোখে ধর্ষণ, চোখে চোখে ক্ষুধা, অবদমন– নিত্যদিন। শহীদমিনারে অনশনরত গরিব শিক্ষকদের ওপর পুলিশের রঙিন বলাৎকার, শিক্ষার্থীর ওপর শিক্ষকের বলাৎকার, ছাত্রসমাজের ওপর ছাত্রলীগের বলাৎকার, শ্রমিক-কর্মচারীদের ওপর গার্মেন্টস-মালিকের বলাৎকার, আসামিদের ওপর কারাগার এবং আদালতের বলাৎকার, অনুগামীর ওপর হুজুরের বলাৎকার, পাঠক আর দর্শকের ওপর মিডিয়ার বলাৎকার নিত্যদিন।

ষাটের দশকে ‘মেকানিক্যাল ব্রাইড’ বা ‘যন্ত্রবধু’ গ্রন্থে মার্শাল ম্যাকলুহান লিখেছিলেন বিজ্ঞাপনবধুর হালচালের কথা। বিজ্ঞাপনের মডেল তখন ‘আমাকে দেখো’ যুগ পার হয়ে ‘আমাকে ছুঁয়ে দেখো’র যুগে প্রবেশ করেছেন। আর আজকের দিনে এসে সেই মডেল বলছেন ‘আমাকে আস্বাদন করে দেখো’। এ হলো পুঁজিবাদের আজকের কণ্ঠস্বর। মেকানিক্যাল ব্রাইড এখন রাস্তায়। হাঁটছেন মিডিয়া-ম্যানুয়াল অনুসারে। হাজার বছরের অবদমন ভেঙে ক্ষুধা জেগে উঠছে কামের। হয় তাকে স্বীকার করতে হবে নইলে খুলে দিতে হবে ধর্ষনের সদর দরজা। এই পরিস্থিতি ঢের বেশি আত্মঘাতী টাঙ্গাইলের দলবদ্ধ ধর্ষণের চেয়ে। আত্মঘাতী– কেননা নিজেকে হত্যা না করে কেউ অন্যকে হত্যা করতে পারে না। এভরি মার্ডার ইজ এ সুইসাইড অ্যান্ড এভরি সুইসাইড ইজ এ মার্ডার। নিজেকে ধর্ষণ না করে, খোদ মনুষ্যসত্তাকে বিনষ্ট না করে, সত্তার সতীত্ব নস্যাৎ না করে, কেউ অপরকে ধর্ষণ করতে পারে না। প্রতিটা ধর্ষণ তাই আত্মবিনাশী, আত্মাবিনাশী, মনুষ্যত্ববিনাশী। যাঁরা খুন এবং ধর্ষণের মধ্যে তুলনা করে এক দিকে ধর্ষণকে মহিমান্বিত করেন এবং

অন্য দিকে খুনকে নৈমিত্তিক ঘটনায় পর্যবসিত করেন, তাঁরা উভয়কেই শাশ্বত করে তোলার চিন্তা-এজেন্ট মাত্র। যে নারী নিজেকে বা নিজেদেরকে এতটাই পৃথক একটা পদার্থ বলে ভাবেন যে একেবারে ভিন্ন একটি ক্যাটেগরিতে নিজেদের দুঃখদুর্দশাকে ফেলতে চান, তাঁরা খোদ নারীকে বিপদাপন্ন করেন, স্বয়ং অত্যাচারকে আড়াল করে ফেলেন।

১.৯ মুক্ত প্রেমময় সমাজের দিকে

আসলে, মনুষ্য-সমাজে কোথাও কোনো ভালোবাসা আর টিকতে পারছে না বলেই ধর্ষণ বাড়ছে। ধর্ষণ আসলে প্রেমহীন সমাজের প্রেম। বলপ্রয়োগ ও বৈষম্যের সুদৃঢ় ভিত্তিপ্রস্তরের ওপর দাঁড়ানো সমাজে প্রেম বাঁচে না। প্রেমে উঁচুনিচু নেই। প্রেম মানে সমতা। প্রেমে জোরাজুরি নেই। প্রেম মানে বলপ্রয়োগের অবৈধতা। প্রেম প্রকৃতিরই নিয়ম। প্রেম মানে পরিচয়, বোঝাপড়া। প্রেম মানে সংহতি, পরস্পর-সহযোগিতা। প্রেম মানে স্বাধীনতা– জিম মরিসনের সেই গানের মতো: ‘বন্ধু তো সে, যে তোমাকে পেতে দেয় পূর্ণ স্বাধীনতা, যেন তুমি হয়ে ওঠো তুমিই নিজে’। ভালোবাসা, সমতা, সংহতি, বোঝাপড়া, পরস্পর-সহযোগিতা আর স্বাধীনতার গুণাবলী প্রকৃতিসূত্রে পাওয়া মনুষ্য-স্বভাবেরই লক্ষণ। মিডিয়াশাস্ত্রের প্রচারণা যা-ই বলুক, এইসব সহজাত মানবীয় প্রবৃত্তি অ্যানার্কিরও লক্ষণ বটে।

বিদ্যমান রাষ্ট্র-রাজনীতি-সমাজ থেকে বৈষম্য ও বলপ্রয়োগকে উচ্ছেদ করার আলাপ বাদ দিয়ে খোদ বলপ্রয়োগেরই মাধ্যমে ধর্ষণকে উচ্ছেদ করার কথাবার্তা বলে মুখে ফেনা তোলাটা মোটেও অর্থহীন নয়– অত্যন্ত অর্থপূর্ণই বটে। ধর্ষকের গলা কাটা বা নুনু কাটার প্রতিশোধপরায়ণ সমাধান ধর্ষণের যুক্তিবোধকেই বৈধতা দেয়। এতে করে খোদ ধর্ষণের যুক্তিটা উৎপাটিত হয় না। ধর্ষণ থেকে যায়। মাঝখান থেকে রাষ্ট্রের আইনপ্রয়োগকারীদের হাতে আরো ধারালো

অস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। মোট অত্যাচার বাড়ে।

শাস্তি দেওয়া আর শিক্ষা দেওয়া বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থা ও আইনের শাসনের কাছে একই ব্যাপার। এ হচ্ছে কর্তৃত্বপরায়ণ আইনপ্রথার প্রাথমিক শিক্ষা বা প্রাথমিক পাঠ। প্রতিশোধই আইন-শাস্ত্রের প্রাথমিক ন্যায়শিক্ষা। আইনের শাসনের চোখে ন্যায়নীতি হচ্ছে প্রতিশোধনীতি। এই 'ন্যায়' স্রেফ মাৎস্যন্যায় মাত্র।

মাৎস্যন্যায়ই হচ্ছে রাজনীতি। ধর্ষণের রাজনীতি মোতাবেক নির্দিষ্ট ধর্ষককে আইনত 'ধর্ষণ' করে খোদ ধর্ষণ ব্যাপারটাকে বাঁচিয়ে রাখা যায়– বাঁচানো যায় বৈষম্য ও বলপ্রয়োগভিত্তিক তথাকথিত আইনের শাসনের অনন্ত প্রেমহীনতাকে। এ থেকে উদ্ধার পাওয়ার পথ গেছে বৈষম্যহীন-বলপ্রয়োগহীন-বলাৎকারহীন মুক্ত প্রেমময় সমাজ পরিগঠনের দিকে। অ্যানার্কির দিকে।

হদিস

হরিচরণ বন্দোপাধ্যায়, ১৯৯৬-ক। *বঙ্গীয় শব্দকোষ*। চতুর্থ মুদ্রণ। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: সাহিত্য অকাদেমি।

হরিচরণ বন্দোপাধ্যায়, ১৯৯৬-খ। *বঙ্গীয় শব্দকোষ*। চতুর্থ মুদ্রণ। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: সাহিত্য অকাদেমি।

রচনা
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: ১৬ই জানুয়ারি ২০১৩

প্রকাশের হদিস
দৈনিক সোনার দেশ, রাজশাহী: ১৮ই জানুয়ারি ২০১৩
দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা: ২৯শে জানুয়ারি ২০১৩